সরল সন্দর্ভ।

শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সিংহ চৌধুরী।
স্বত্বাধিকারী—"রামমাণিক্য পেপার ডিপো।"
সাহজিয়ালনগর, ঢাকা।
১৩২১

মূল্য ।/০ পাঁচ আনা মাত্র।

ভূমিকা।

সুকুমারমতি বালকবালিকাগণের সুশিক্ষার উপযোগী বহু গ্রন্থই প্রকাশিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতেও ঐ বিষয়ের পূর্ণ অভাব বিদূরিত হইয়াছে—এমন কথা বোধ হয় বলা সঙ্গত হইবে না। আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিও আংশিক ভাবে সেই অভাব দূরীকরণেরই ক্ষীণ প্রয়াস মাত্র। কৃতকার্য্য কতদূর হইয়াছি, তাহা সুধীগণের বিচার্য্য।

বিশেষ কারণে পুস্তকখানি অতি তাড়াতাড়ি লিখিত ও মুদ্রিত হইয়াছে। এমন কি প্রবন্ধগুলি লিখিয়া পরীক্ষা করিয়া দেওয়ারও সুযোগ বড় হয় নাই। কাজেই গ্রন্থখানিতে নানারূপ ত্রুটি ও মুদ্রাকর-প্রমাদ থাকিতে পারে। আশা করি আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী সুধীজন মার্জ্জনা করিবেন। ইতি—

ঢাকা।
৯ই আশ্বিন ১৩২১ সন।

শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়।

Wari - Dacca

সূচীপত্র।

পদ্যাংশ।

পরিশিষ্ট।

সরল সন্দর্ভ।

গুরুভক্তি—একলব্য।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে পাণ্ডব ও কৌরব নামে বিখ্যাত দুই রাজবংশ ছিল। নানাগুণবিভূষিত পাণ্ডব ও কৌরবগণ পৃথিবীতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস তাঁহার অমৃতময়ী লেখনীদ্বারা সুপ্রসিদ্ধ মহাভারত নামক গ্রন্থে কুরুপাণ্ডবের সেই কীর্ত্তি-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

কৌরব ও পাণ্ডব রাজকুমারগণ বাল্যকালে দ্রোণাচার্য্য নামক এক মহাবীর ব্রাহ্মণের নিকট যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। তন্মধ্যে পাণ্ডব-বংশীয় অর্জ্জুন বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। দ্রোণাচার্য্যের তিনিই প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন। তাঁহার অশেষ গুণে দ্রোণাচার্য্য বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট অঙ্গীকার করেন যে, তিনি শিষ্যগণ-মধ্যে অর্জ্জুন অপেক্ষা আর কাহাকেও কদাপি

শ্রেষ্ঠতর হইতে দিবেন না। দ্রোণাচার্য্যও প্রাণপণ করিয়া অর্জ্জুনকে উৎকৃষ্ট শিক্ষা দান করিয়াছিলেন।

একদা পাণ্ডব ও কৌরবগণ মৃগয়ার্থে বনে গমন করেন। একলব্য নামে এক নিষাদ রাজপুত্র ঐ সময় সেই বনে উপস্থিত হয়েন। তাঁহাকে দেখিয়া পাণ্ডবগণের সঙ্গীয় একটি কুকুর চীৎকার করিতে করিতে তৎপ্রতি ধাবমান হয়। তখন একলব্য কুকুরটির গ্রীবাদেশে সাতটি শর এমনভাবে বিদ্ধ করিলেন যে, কুকুর প্রাণে মরিল না বটে কিন্তু তাহার চীৎকার করিবার শক্তি একেবারে রুদ্ধ হইল। এই ঘটনা সন্দর্শন করিয়া কৌরব ও পাণ্ডব রাজকুমারগণ বিস্মিত হইয়া গেলেন এবং সকলে সবিশেষ আগ্রহে একলব্যের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। একলব্য আপনার যথাযোগ্য পরিচয় প্রদান-পূর্ব্বক নিজকে দ্রোণাচার্য্যেরই শিষ্য বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিলেন। তখন সকলে আরও বিস্মিত হইল।

রাজকুমারগণ অতি ক্ষুণ্ণ মনে বন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, কারণ তাঁহারা সকলেই আপনাদিগকে শরসন্ধানবিদ্যায় একলব্য হইতে হীন মনে করিতে লাগিলেন। বীরবর অর্জ্জুন গুরু দ্রোণাচার্য্যের নিকট সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিয়া, তাঁহার প্রতিজ্ঞার বিষয়

স্মরণ করাইয়া দিলেন। অর্জ্জুনের উক্তি শ্রবণ করিয়া, দ্রোণাচার্য্য একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন; কারণ তিনি একলব্যকে কোন কালেও কিছু শিক্ষা দিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না।

অতঃপর দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া একলব্যের নিকট গমনপূর্ব্বক তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলেন। একলব্য দ্রোণাচার্য্যের চরণে সভক্তি প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেনঃ—"প্রভো, বাল্যকালাবধিই আমার হৃদয়ে ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষার এক বেগবতী তৃষ্ণা জন্মে। আমি বহুকাল পূর্ব্বে তজ্জন্য আপনার শরণাগত হই। কিন্তু আমি হীনজন্মা ব্যক্তি বলিয়া, আপনি আমাকে শিক্ষাদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। উহাতে আমি প্রাণে যে কিরূপ আঘাত প্রাপ্ত হই, তাহা আমার ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। কিছু কাল আমি হৃদয়ে একটুকু বল বাঁধিয়া, আমার কাম্য বিষয়ে সিদ্ধি লাভের চেষ্টায় ব্রতী হইলাম। আমি মনে মনে আপনাকে গুরুর পদে বরণ করিয়া আপনার দেবমূর্ত্তি চিরকালের তরে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিলাম এবং আপনার শিক্ষা-পদ্ধতি দূর হইতে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। এইরূপ করিয়াই আমি একাগ্র চিত্তে আমার শিক্ষার পথে অগ্রসর হইতে থাকিলাম।

গুরুদেব, আমি এই প্রকারে যাহা কিছু পারিয়াছি তাহাই শিক্ষা করিয়াছি ”

একলব্যের বাক্য শ্রবণে অর্জ্জুন একেবারে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং দ্রোণাচার্য্য মনে মনে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। “আমার শিষ্যগণ মধ্যে কাহাকেও তোমা হইতে শ্রেষ্ঠতর হইতে দিব না”—অর্জ্জুনের নিকট এই প্রতিজ্ঞা-বাক্যের কথা দ্রোণাচার্য্যের মনে হওয়ায়, তিনি বড়ই বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। একলব্যের প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্নেহের উদ্রেক হইলেও, তিনি তাহার পরিচয় প্রদানে সমর্থ হইলেন না। দ্রোণাচার্য্য তখন একলব্যকে বলিতে লাগিলেন, “হে বীরবর, তুমি যদি প্রকৃতই আমার শিষ্য হইয়া থাক, তবে আমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান কর।” একলব্য তখন প্রীতমনে গুরুর আদেশ মত দক্ষিণা দিতে স্বীকৃত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, “একলব্য তুমি তোমার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি কর্ত্তন করিয়া আমাকে দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান কর।” গুরুভক্ত ও সত্যবাদী একলব্য হৃষ্টচিত্তে স্বীয় দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি কর্ত্তন করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করিলেন।

একলব্যের এই প্রকার অলৌকিক গুরুভক্তি সন্দর্শনে

দ্রোণাচার্য্য ও অর্জ্জুন একেবারে স্তম্ভিত হইলেন! পৃথিবী ভরিয়া তাঁহার যশোগান হইতে লাগিল।

স্বাস্থ্যরক্ষা।

স্বাস্থ্য মানবের পরম সুখের কারণ। শরীর সুস্থ না থাকিলে, কেহ কোন কার্য্যই করিতে পারে না এবং এ সংসারে ধর্ম্ম, কর্ম্ম বা বিদ্যা ইহার কিছুই লাভ হয় না। স্বাস্থ্যরক্ষা করাই মানুষের প্রধান কর্ত্তব্য, যে ব্যক্তি নিজের শরীর সুস্থ রাখিতে যত্ন করে না, সে আপন দেহকে ভালবাসে না। যে নিজের দেহকেই ভালবাসে না, সে আর কিছুই বিশেষ ভালবাসিতে পারে না।

কিরূপে শরীর সুস্থ রাখা যায়, তাহার মোটামুটি নিয়মগুলি সকলেরই জানা উচিত। সর্ব্ববিষয়ে মিতাচার রক্ষা করিয়া চলা—স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপায়। অতি-ভোজন, অতিনিদ্রা, অতিপরিশ্রম, অতিজাগরণ ইত্যাদি সকল বিষয়েই অতিরিক্ত মাত্রা পরিত্যাগ করা উচিত। সর্ব্বদা বিশুদ্ধ বায়ুসেবন, পরিষ্কৃত জল পান, উপযুক্ত ব্যায়াম, রীতিমত আহার ও বিশ্রাম ইত্যাদি স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ সহায়।

শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে নিদ্রা হইতে জাগিয়া পরমেশ্বরকে চিন্তা করিবে এবং 'শরীর বেশ সুস্থ আছে' বলিয়া মনে মনে ভাবিয়া. বিছানা পরিত্যাগ করিবে। তাহার পর মুখে জল পূর্ণ করিয়া, হস্তদ্বারা চক্ষে বারংবার জলের ঝাপ্‌টা দিবে। পরে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া, হাতমুখ ধুইবে ও পরিষ্কৃত বস্ত্রাদি পরিধান করিবে। তৎপরে নিজের সাধ্যমত ব্যায়াম করিবে এবং খোলা জায়গায় সূর্য্যের আলোকে বেড়াইবে। নিজ নিজ ধর্ম্মের ব্যবস্থামত পরমেশ্বরের উপাসনাদি প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে করিবে। প্রতিদিন নির্দ্দিষ্টকালে স্নান ও আহার করা স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপায়। পরিষ্কৃত ও টাট্‌কা খাদ্য খাইবে; বলকারী অথচ সহজে যাহা পরিপাক হয়, তাহাই উত্তম খাদ্য। অতি ঝাল, অতি লবণ, অতি টক এবং অতি কটু তিক্ত বস্তু ভোজন করিবে না। উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিবে না এবং খাদ্যবস্তু খুব ভালরূপ চিবাইয়া খাইবে। খাওয়ার সময় অল্প অল্প জল পান করিবে। আহারের পর ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া, পরে কর্ত্তব্য কার্য্যাদি করিবে। হাত, পা, মুখ ইত্যাদি সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখিবে ও ধৌত করিবে। কদাপি কোন মাদক দ্রব্য সেবন

করিবে না। নির্ম্মল জলে স্নান করিয়া শরীর মার্জ্জনা করিবে। বৈকাল বেলায় ও সাধ্যমত ব্যায়াম করিয়া খোলা জায়গায় বেড়াইবে। রাত্রিতে আহারাদি করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রামের পর শয়ন করিবে। ছয় ঘণ্টার কম ও আট ঘণ্টার বেশী নিদ্রা যাইবে না। পরিষ্কৃত বিছানায় শয়ন করিবে। শয়ন ঘরে দিবারাত্র যেন বিশুদ্ধ বায়ু খেলিতে পারে, ইহা দেখিবে। প্রথমে বিছানায় চিং হইয়া শুইয়া পরে ক্ষণকাল বামপার্শ্বে থাকিবে; তৎপর ডা'ন পার্শ্বে শয়ন করিয়া পরমেশ্বরকে চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রা যাইবে। ময়লা ও আবর্জ্জনা পূর্ণ স্থানে কদাপি থাকিবে না। সর্ব্বদা সকল কার্য্যে ঈশ্বরকে চিন্তা করিবে ও আপনার অবস্থায় সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিবে। দুর্ভাবনা, কুবাসনা ইত্যাদি মন হইতে দূর করিবে।

রাজা।

রাজা এই পৃথিবীর লোক পালন করিয়া থাকেন। তিনি দেশের রক্ষাকর্ত্তা। রাজা না থাকিলে দেশ অরাজক হয়। রাজা দুষ্ট জনকে দমন করে ও শিষ্ট

জনকে রক্ষা করেন। দেশের লোকের অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, মারীভয়, দস্যুভয় ইত্যাদি রাজাই নিবারণ করিয়া থাকেন এবং তিনি প্রজার নানা প্রকারের অভাব ও অভিযোগের প্রতিবিধান করিতে নিয়ত যত্নবান রহেন। রাজা আছেন বলিয়াই, দেশে কেহ কাহারও উপর অত্যাচার বা সবল দুর্ব্বলকে উৎপীড়ন করিতে পারে না। ঈশ্বর জীবগণের সৃষ্টি করিয়াছেন, আর রাজা সেই সৃষ্টি রক্ষা করিতেছেন, অতএব রাজা মানবের পরম হিতকারী রাজাকে সকলেরই ভক্তি করা উচিত।

সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জ এখন এই ভারতবর্ষের রাজা। তিনি পরলোকগত সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ডের পুত্র এবং পরলোকগতা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পৌত্র। বিগত ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ইয়োরোপ মহাদেশের ইংলণ্ড নামক রাজ্যে বাস করেন।

সম্রাট জর্জ্জ দুইবার তাঁহার মহিষী মহারাণী মেরীকে সঙ্গে লইয়া এই ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তিনি ভারতের প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানে যাইয়া দেশের অবস্থা স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আগমনে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্রই উৎসবের স্রোতঃ বহিয়াছিল। ভারতবাসীরা তাঁহার প্রতি

আন্তরিক রাজভক্তির পরিচয় দিয়াছিল। তিনিও প্রাণ খুলিয়া ভারতের প্রজাগণকে ভালবাসা জানাইয়াছিলেন। তিনি প্রথমবারে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয়বারে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ভারত পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন। শেষবারে দিল্লীনগরীতে ভারতের চিরস্মরণীয় "সম্রাট জর্জ্জের রাজ্যাভিষেক" দরবার হইয়াছিল এবং সেই উপলক্ষে ভারতের রাজন্যবর্গ এবং প্রত্যেক প্রদেশ ও জাতির প্রতিনিধিবর্গ দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন।

সম্রাট জর্জ্জ বহুগুণান্বিত নরপতি বটেন। তিনি বড় ন্যায়বান ও দয়ালু। ভারতের প্রজাগণকে তিনি অন্তরের সহিত ভালবাসেন। ঈশ্বর ভারতসম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে রক্ষা করুন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

এই স্বনামধন্য পুরুষ ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ২৫শে মার্চ্চ কলিকাতা মহানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম বিশ্বনাথ তর্কভূষণ। অষ্টম বৎসর বয়সে ভূদেব

বিদ্যাশিক্ষার জন্য কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হয়েন। ইহার পরে তিনি হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করেন। ভূদেব পাঠ্যাবস্থায় বিশেষ ভাল ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। প্রতিবর্ষে তিনি বহু পুরস্কার ও বৃত্তি লাভ করিতেন। বাঙ্গালার অমরকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার সমপাঠী ছিলেন। পরিশ্রম ও মনোযোগ সহকারে বিদ্যাশিক্ষা করিলে যে সুফল লাভ করা যায়, ভূদেব তাহার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। ভূদেব উত্তরকালে বাঙ্গালাদেশের অদ্বিতীয় লোক বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন।

বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া, ভূদেব দেশের লোকের বিদ্যাশিক্ষার জন্য নানাস্থানে স্কুল স্থাপনের চেষ্টা করিতেন এবং কিছুকাল এইজন্য নিজে নানাপ্রকারে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া ছিলেন।

কিছু দিন পরে ভূদেব মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে কলিকাতা মাদ্রাসার দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়েন। পর বৎসর মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে তিনি হাবড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। ঐ সময় কলিকাতা নর্ম্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ খালি

হয়। ঐ কার্য্যের লোকনির্ব্বাচন জন্য একটি পরীক্ষা হয়। ভূদেব ঐ পরীক্ষা দিয়া প্রথম হইয়াছিলেন। ইহাতে তিনি মাসিক ৩০০৲ টাকা বেতনে ঐ পদে নিযুক্ত হয়েন। ইহার পরে তিনি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে স্কুলের সহকারী ইনস্পেক্টার এবং পরিশেষে ইনস্পেক্টারের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার বেতন মাসিক ১৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। তিনি অল্পদিনের জন্য অস্থায়িভাবে বাঙ্গালাদেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টারের পদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। একমাত্র আপনার প্রতিভাবলেই ভূদেব এইরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যপটুতা, নির্ম্মল চরিত্র ও হৃদয়ের উদারতায়, তিনি সকলের ভক্তিভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার নানাগুণে মুগ্ধ হইয়া, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি-আই-ই উপাধি প্রদান করেন।

পিতামাতার প্রতি ভূদেবের অসাধারণ ভক্তি ছিল। তিনি পিতার নামে "বিশ্বনাথ ট্রাষ্টফাণ্ড" নামক দেড়লক্ষ টাকার একটি তহবিল সৃষ্টি করেন। তাহার স্থদ হইতে তাঁহার পিতার নামে স্থাপিত "বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী" ও মাতার নামে স্থাপিত "ব্রহ্মময়ী ঔষধালয়ের" ব্যয় চলিতেছে। উক্ত চতুষ্পাঠী হইতে বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও

টোলের ছাত্র সাহায্য পাইয়া থাকে এবং ঔষধালয় হইতে দেশের বহু দরিদ্র লোক বিনামূল্যে ঔষধ পাইতেছে। সামান্য ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরে জন্মিয়া, ভূদেব একমাত্র নিজের ক্ষমতায় দেশে একজন বিখ্যাত লোক বলিয়া পরিচিত হইয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ ভূদেব বাঙ্গালীর গৌরব ছিলেন।

ভূদেব "শিক্ষাদর্পণ" নামে একখানি মাসিক পত্র ও "এডুকেশন গেজেট" নামে এক সাপ্তাহিক পত্র পরিচালন করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি বাঙ্গালাভাষায় বহু ভাল ভাল পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বস্তুতঃ কি শিক্ষা, কি চরিত্র, কি দানশীলতা কি লোকহিতকর কার্য্য, যে দিক দিয়াই ধরা যায়, ভূদেবের মত লোক দেশে অতি অল্পই জন্মিয়াছে। তাঁহার জীবনচরিত সকলেরই বিশেষ শিক্ষার বিষয়। ১৮৯৪ সনের ১৬ই মে এই বিখ্যাত পুরুষ পরলোকগমন করিয়াছেন।

সত্যকথা—আব্দুলকাদের।

মুসলমানধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা মোহম্মদের দৌহিত্র হাসেনের বংশে আব্দুলকাদের নামে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষার জন্য বোগ্‌দাদ নগরে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেখানে যাওয়ার কালে তাঁহার মাতা তাঁহার হাতে চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়া বলিলেন, "বাবা তোমার প্রাপ্য এই পৈত্রিক ধন তোমাকে দিলাম। আমি আজ তোমাকে দয়াময় পরমেশ্বরের হাতে সমর্পণ করিলাম। তাঁহাকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া চলিবে, সৎপথে থাকিবে ও সত্যকথা কহিবে। তাঁহার কৃপায় তোমার সকল বিপদ কাটিয়া যাইবে।" মাতা এইরূপে পুত্রকে উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বর্ণমুদ্রা কএকটি তাহার গায়ের জামার নীচে ভালরূপ আঁটিয়া দিলেন। অতঃপর কাদের পরমেশ্বরের নাম স্মরণ পূর্ব্বক মাতার চরণ বন্দনা করিয়া বাড়ী হইতে যাত্রা করিলেন।

দৈবদুর্ব্বিপাকে কতিপয় দস্যু আব্দুলকাদেরকে রাস্তায় আক্রমণ করিল। দস্যুদিগের দলপতি কাদেরকে অল্পবয়স্ক বালক দেখিয়া, তাহাকে ছাড়িয়া দিতে দলের লোকদিগকে আদেশ করিল এবং বলিল যে "এইরূপ

বালকের নিকট আর কি থাকিতে পারে?” তখন একজন দস্যু কাদেরকে জিজ্ঞাসা করিল, “বালক, তোমার নিকট কিছু আছে কি?” আব্দুলকাদের মিথ্যাকথা বলা এতই ঘৃণাজনক ও পাপের কার্য্য মনে করিতেন যে, দস্যুর নিকটও মিথ্যা বলিতে বিমুখ হইলেন। তিনি তখন সরলভাবে দস্যুর নিকট বলিলেন যে তাঁহার জামার নীচে চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা আছে। কাদের এই কথা বলামাত্র দস্যুগণ তাহার জামার নীচ হইতে মুদ্রাগুলি বাহির করিয়া লইল।

আব্দুলকাদেরের এইরূপ ব্যবহারে দস্যুদলপতি বড়ই বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিল, “বালক, তুমি কেন সত্যকথা বলিয়া নিজের ক্ষতি করিলে?” কাদের বলিলেন, “মিথ্যা কথা বলা বড় পাপ; আমার মাতা আমাকে সর্ব্বদা সত্যকথা বলিতে আদেশ করিয়াছেন। আমি তাঁহার আদেশ নিয়ত পালন করিয়া থাকি।”

বালক কাদেরের কথা শুনিয়া দস্যুপতির যেন চমক ভাঙ্গিল এবং তাহার অন্যায় কার্য্যের জন্য তাহার হৃদয়ে বড়ই অনুতাপ জন্মিল। দলপতি বালকের মুদ্রাগুলি তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, “বালক, তুমি নির্ভয়ে চলিয়া যাও। আজ তোমাদ্বারা আমার বিশেষ

শিক্ষালাভ হইল।” তদবধি দস্যুপতি প্রকৃতই সৎপথ অবলম্বন করিয়াছিল।

আব্দুলকাদেরের সত্যবাদিতাগুণে দস্যুর হাতেও তাঁহার ধন রক্ষা পাইল। ঘৃণিত দস্যুও সৎপথে আসিল।

বাঙ্গলাদেশ।

সমস্ত পৃথিবী পাঁচটি মহাদেশে বিভক্ত হইয়াছে, যথা —এসিয়া, ইওরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া। এসিয়া মহাদেশের দক্ষিণমধ্যভাগে ভারতবর্ষ নামক দেশ অবস্থিত। এই ভারতবর্ষই আমাদের দেশ বটে। বাঙ্গালাদেশ এই ভারতবর্ষেরই অন্তর্গত একটি প্রদেশ।

ভারতবর্ষ পৃথিবীর সকল দেশ হইতে অতিপুরাতন সভ্য দেশ। প্রথমে এই দেশে কতকগুলি অসভ্য লোক বাস করিত। তাহার পর “আর্য্য” নামধারী হিন্দুরা এদেশের রাজত্ব প্রাপ্ত হয়েন। পরে মুসলমানগণ ভারতবর্ষ অধিকার করেন। শেষে ইংরেজ এইদেশের রাজা হইয়াছেন।

বাঙ্গালাদেশ ভারতবর্ষের দক্ষিণপূর্ব্বদিকে অবস্থিত। এই দেশের উত্তরসীমা নেপাল ও ভুটানদেশ, পূর্ব্বসীমা আসাম ও ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণসীমা বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমসীমা বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ।

বাঙ্গলাদেশই ইংরেজ প্রথম অধিকার করেন, পরে তাঁহারা ভারতের অন্যান্য দেশ অধিকার করিয়াছেন। ভারতবর্ষ মধ্যে বাঙ্গলাদেশই সকল প্রকারে শ্রেষ্ঠদেশ। বাঙ্গালাদেশের অধিবাসীকে বাঙ্গালী কহে। বাঙ্গালীরা পৃথিবীতে বুদ্ধিমান ও সুসভ্য জাতি বলিয়া পরিচিত। বাঙ্গালাদেশে নানাপ্রকারের শস্য, ফল ইত্যাদি জন্মিয়া থাকে, যথা—ধান, পাট, কলাই, সরিষা, গম, তামাক এবং আম, কাঁটাল, নারিকেল, গুবাক, কলা, জাম ইত্যাদি। এই দেশের অধিকাংশ লোকেরই কৃষিকার্য্য প্রধান ব্যবসায় বটে। এই দেশের জঙ্গলে ব্যাঘ্র, হরিণ, শূকর, ভল্লুক ও সর্প প্রভৃতি অনেক প্রকার হিংস্র জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেশে পাথর কয়লার খনিও আছে। বাঙ্গালার অনেক স্থানে উৎকৃষ্ট কাপড়, বাসন, ও লোকের ব্যবহারের নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে সোণা, রূপা ও শাঁখা ইত্যাদির উত্তম বস্তুও নির্ম্মিত হয়। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে

যে বাঙ্গালা দেশ ধনধান্যে পূর্ণ এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক লোকের জন্মস্থান।

মেঘ ও বৃষ্টি।

আকাশে মেঘ হয়, আবার সেই মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়, ইহা তোমরা সর্ব্বদাই দেখিয়া থাক। কিরূপে এই মেঘ বৃষ্টি হয়, তাহারই বিবরণ এখানে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

পৃথিবীর চারিদিক্ ঘেরিয়া বড় বড় সমুদ্র রহিয়াছে। সূর্য্যের কিরণে সমুদ্রের জল উত্তপ্ত হইয়া বাষ্পাকারে শূন্যে উঠে। ঐ বাষ্পসকল আকাশে শীতলতায় জমিয়া যায়। উহাকেই মেঘ কহে। এই মেঘগুলি বাতাসের দ্বারা পৃথিবীর নানা দিকে চালিত হয়। এইরূপ চলিতে চলিতে কোনও স্থানে অধিক শীতলতা পাইলে, মেঘসকল জমিয়া ভারী হয় ও বাতাসের উপর ভাসমান থাকিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া, তখনই বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পড়িতে থাকে।

এই বৃষ্টির জলের কতক ভাগ ভূ-গর্ভে চলিয়া যায় এবং মৃত্তিকারাশিকে সরস রাখে। কতক ভাগে খাল,

বিল ও পুকুর পূর্ণ হয়। আবার কতক ভাগ নদনদীর জল বর্দ্ধিত করিয়া সাগরে চলিয়া যায়।

বৃষ্টির জল পৃথিবীর বিশেষ হিতকারক। বৃষ্টির জলে ভূমি সরস থাকে, তাহাতেই বৃক্ষলতাদি জন্ম ধারণ করে। বৃষ্টিতে মৃত্তিকা রসযুক্ত হইলে, কৃষকেরা তাহা চাষ করিয়া নানারূপ শস্য বপন করে এবং বৃষ্টির জল পাইয়াই শস্যক্ষেত্রগুলি সুফল দান করে। কাজেই পৃথিবীতে ফল, মূল, শস্যাদির জন্য বৃষ্টি প্রধানতঃ আবশ্যক। সূর্য্যের উত্তাপে পৃথিবী যখন বেশী উত্তপ্ত হইয়া পড়ে, তখন বৃষ্টি সেই তাপের সমতা জন্মায়। বৃষ্টির জলে খাল, বিল ও পুষ্করিণী ইত্যাদি পূর্ণ করিয়া, জীব-জন্তুর পানীয় জলের সহায়তা করে। আবার বর্ষাকালে বৃষ্টি দ্বারা ভূ-ভাগের আবর্জ্জনাদি দূরীভূত হয়। ইহা ব্যতীত বৃষ্টির জলদ্বারা অনেক সময় দূষিত বায়ু শোধিত হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে, বৃষ্টি জগতের পরম উপকারী এবং জীবজন্তুর পক্ষে বড় আবশ্যক।

পিতৃভক্তি—কেসাবিয়েন্‌কা।

কেসাবিয়েন্‌কা নামে এক বালক ইউরোপ মহাদেশের এক যুদ্ধজাহাজের অধ্যক্ষের পুত্র ছিল। তাহার পিতা যখন "এল্ অরিয়েন্ট" নামক যুদ্ধ জাহাজে কার্য্য করিতেন, তখন 'নাইল' নদের বৃহৎ যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধের সময় কেসাবিয়েন্‌কার পিতা তাহাকে জাহাজের কোনও এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া বলিয়া গেলেন যে, তিনি যতক্ষণ পর্য্যন্ত ফিরিয়া না আসেন, ততক্ষণ যেন সে ঐস্থান পরিত্যাগ না করে।

কেসাবিয়েন্‌কার পিতা ঐ যুদ্ধে শত্রু পক্ষের কামানের গোলায় আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কেসাবিয়েন্‌কা তাহা জানিতে পারিল না। এদিকে বিপক্ষের অজস্র কামানের গোলা পড়িয়া জাহাজে আগুণ ধরিয়া গেল। চারিদিকে আগুণ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু কেসাবিয়েন্‌কা তখনও নির্ভয়ে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল, আর চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "বাবা, আমি কি এখন এই স্থান ত্যাগ করিয়া যাইব? আমার কর্ত্তব্য কি শেষ হইয়াছে?" কিন্তু বালকের কথা কেহ শুনিল না, বা কেহ কোন উত্তর

করিল না। তাহার পিতা তখন অচেতন অবস্থায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন।

অগ্নি ক্রমে কেসাবিয়েন্‌কার নিকটবর্ত্তী হইল। জ্বলন্ত শিখাগুলি তাহার গায় লাগিতে লাগিল। কিন্তু পিতৃভক্ত বালক পিতার আদেশ ব্যতীত সেই স্থান হইতে এক পা-ও নড়িবে না। সে পুনরায় কহিতে লাগিল "বাবা, বল এখনও আমি চলিয়া যাইতে পারি কি?" কিন্তু সেই বীর বালকের কথার উত্তর কে দিবে? ক্রমে আগুণ আসিয়া কেসাবিয়েন্‌কার শরীর ধরিয়া ফেলিল, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দগ্ধ হইতে লাগিল। তখনও সেই দেব-বালক নির্ভয়ে সেখানে দাঁড়াইয়া বলিল, "বাবা, তোমার আদেশ ভিন্ন আমি এস্থান ত্যাগ করিতে পারি না।" এইরূপে পিতৃভক্ত বালক পিতার আদেশ পালন করিতে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। তাহার দেহ পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

সার সৈয়দ আহ্‌মদ খাঁ।

এই বিখ্যাত পুরুষ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর ভারতবর্ষের দিল্লী নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম মোহাম্মদ তকীখাঁ; তকীখাঁ বড় ধার্ম্মিক লোক ছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই সৈয়দ আহ্‌মদ খাঁর বিদ্যাশিক্ষার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি উর্দ্দু ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং ইংরেজী ভাষাও উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। তিনি বহু ইংরেজী পুস্তক উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে আহ্‌মদ খাঁ ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে মুন্‌সেফের পদে নিযুক্ত হয়েন। তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সব-জজের পদে উন্নত করেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের সিপাহীসৈন্যগণ অজ্ঞতা-বশে ইংরেজগবর্ণমেণ্টের বিদ্রোহী হয়। গবর্ণমেণ্ট অচিরে তাহাদিগকে দমন করিয়া, উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করেন। আহ্‌মদ খাঁ এই সময় গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সহায়তা করিয়া আপনার রাজভক্তির পরিচয় দান করেন।

তিনি জানিতেন যে, রাজার সহায়তা করা প্রজার নিত্য-কর্ত্তব্য এবং তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা মহাপাপ। তাঁহার অসাধারণ রাজভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মাসিক দুইশত টাকা বৃত্তি, একখানা তরবারি ও একটি বহুমূল্য পরিচ্ছদ দান করেন।

সৈয়দ আহ্‌মদ খাঁ ভারতবর্ষে মুসলমানদের প্রধান মুখপাত্র ছিলেন। তিনি দেশের বহুবিধ হিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। মুসলমানগণের সুশিক্ষা দানের জন্য তিনি আলীগড় সহরে এক কলেজ ও ছাত্রাবাস স্থাপিত করেন। ইহা তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি। এই কলেজের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিকল্পে তিনি জীবন ভরিয়া পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন এবং তিনি ইহাদ্বারা মুসলমানগণের উচ্চশিক্ষা লাভের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

দেশের লোকের মধ্যে এক জাতির সহিত অপর জাতির ঝগড়া-বিরোধ তিনি বড় ঘৃণা করিতেন। ভারতের হিন্দুমুসলমান—এই দুই শ্রেষ্ঠ জাতি যাহাতে সর্ব্বদা সদ্ভাবে থাকে, তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি এক বক্তৃতা করিবার কালে বলিয়াছিলেন যে, "হিন্দু ও মুসলমান একটি সুন্দরী নারীর দুইটি চক্ষুর মত বটে; একটি নষ্ট হইলে, অন্যটিও নষ্ট হইবে।"

সার সৈয়দের বহু সৎকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে প্রথমে সি এস আই এবং পরে জি-সি-এস্-আই উপাধি দান করেন। দেশের বহু হিতকর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আহ্‌মদ খাঁ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ৮১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

কলিকাতা ও ঢাকা।

কলিকাতা ও ঢাকা বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বপ্রধান নগর। কলিকাতা বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা দেশের রাজধানী এবং ঢাকা উহার দ্বিতীয় রাজধানী। ভারতবর্ষে ইংরেজ-রাজত্বের প্রথম হইতে কলিকাতা ইংরেজরাজের সমস্ত ভারতরাজ্যের রাজধানী ছিল। গত ১৯১২ খৃষ্টাব্দে দিল্লী নগরী ভারতের রাজধানী হইয়াছে, কাজেই কলিকাতা এখন বাঙ্গালা দেশেরই রাজধানী।

যে নগরে রাজা বা রাজার প্রধান প্রতিনিধি বাস করেন, তাহাকে রাজধানী কহে। আমাদের রাজা ইংলণ্ড দেশে বাস করেন। তাঁহার প্রধান প্রতিনিধিকে "গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয়" বলে। তিনিই

সমস্ত ভারতরাজ্য শাসনের প্রধান কর্ত্তা। বর্ত্তমান সময়ে দিল্লী নগরী তাঁহার প্রধান বাসস্থান বলিয়া দিল্লী ভারতের রাজধানী। গভারনার জেনারেলের নীচে ভারতের প্রদেশে প্রদেশে এক একজন শাসনকর্ত্তা আছেন। বাঙ্গালা দেশের শাসনকর্ত্তা একজন "গভারনার"। কলিকাতা নগরী তাঁহার প্রধান বাসস্থান বলিয়া কলিকাতাকে বাঙ্গলার রাজধানী বলে। তিনি ঢাকাতেও বৎসরের কিছুকাল বাস করেন বলিয়া ঢাকা নগরীকে বাঙ্গলার দ্বিতীয় রাজধানী বলে।

কলিকাতা পূর্ব্বে একটি সামান্য গ্রাম ছিল। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে জবচর্ণক প্রভৃতি কতিপয় ইংরেজ বণিক্ এখানে আসিয়া কুঠি প্রস্তুত করেন। উক্ত বণিগ্‌গণ এখানে থাকিয়া নানাপ্রকার ব্যবসায় করিতে থাকেন। তাহাতেই স্থানটি ক্রমে বড় হইয়া উঠে। তখন ভারতবর্ষে মুসলমানগণের রাজত্ব ছিল। ইংরেজ বণিগ্‌গণ মুসলমান সম্রাট্ আরঙ্গজেবের পৌত্র শাহজাদা আজিমের নিকট হইতে কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী সুতানুটি ও গোবিন্দপুর এই তিনখানি গ্রাম খরিদ করেন। ঐ তিন গ্রাম লইয়াই বর্ত্তমান কলিকাতা সহর। ইংরেজগণ কতকদিন পরে কলিকাতায় একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া-

ছিলেন। তাঁহাদের বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই কলিকাতার উন্নতি হইয়াছিল।

১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদের সহিত বাঙ্গালার সুবাদার নবাব সিরাজদ্দৌলার নানাকারণে যুদ্ধ বাঁধে; ইংরেজপক্ষের সেনাপতি ক্লাইভ পলাশী নামক স্থানে যুদ্ধ করিয়া উক্ত নবাবকে পরাজিত করেন। ইহাতেই ইংরেজেরা বাঙ্গালাদেশের রাজা হয়েন এবং কলিকাতা তাঁহাদের রাজধানী হয়। ইহার পর হইতে ইংরেজগণ ক্রমে ভারতবর্ষের নানাস্থান অধিকৃত করিয়া, ভারতের সম্রাট হইয়া পড়িলেন। কলিকাতা নগরও তখন তাঁহাদের সমস্ত ভারতরাজ্যের রাজধানী হইল। ধীরে ধীরে কলিকাতার সমৃদ্ধি বাড়িয়া ইহা ভারতের অদ্বিতীয় সহর হইয়া পড়িল। পৃথিবীতে ইংরেজের যত রাজ্য আছে, তাহার সমস্ত সহরের মধ্যে কলিকাতা বর্ত্তমান সময়ে দ্বিতীয় সহর বটে।

কলিকাতাকে "অট্টালিকার নগর" বলে। এই নামদ্বারাই পরিচয় পাওয়া যায় যে এত বড় বড় দালান কোটা আর কোন নগরে নাই। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতায় আটলক্ষ লোকের বাস। ইহা ভিন্ন উহার চারিদিকের উপনগরের আবার ঐ পরিমিত লোকের

বসতি হইবে। পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির লোকই নানা-কার্য্য উপলক্ষে এখানে বাস করে। কলিকাতা ভারতের প্রধান বাণিজ্য স্থান।

নিম্নলিখিত স্থানগুলি কলিকাতার প্রধান দ্রষ্টব্য বটে ঃ—লাটসাহেবের বাড়ী, গড়ের-মাঠ, দুর্গ, হাইকোর্ট, যাদুঘর, বিশ্ববিদ্যালয় গৃহ, অক্টোরলোনি মনুমেণ্ট, টাকশাল, বড় ডাকঘর, হগ্‌সাহেবের বাজার, ইডেনগার্ডেন, ভিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দির, হাবড়ার পুল, খিদিরপুরের ডক্ আলিপুরের পশুশালা, পরেশ নাথ মন্দির ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঢাকা বাঙ্গলা দেশের অতি পুরাতন সহর। ভারতে মুসলমান রাজত্বের সময় ঢাকা নগরী বহুকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলার রাজধানী ছিল।

ঢাকা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ আছে। কেহ বলেন এখানে পূর্ব্বকালে বহু "ঢাকবৃক্ষ" * ছিল, তাহা হইতেই এই স্থানের নাম ঢাকা হইয়াছে। কেহ বলেন এই নগরের পশ্চিমে যে হিন্দুদের প্রসিদ্ধ "ঢাকেশ্বরীর" মন্দির আছে, তাহা হইতে এই স্থান ঢাকা নামে পরিচিত হয়। আর এক প্রবাদ এই বাঙ্গলার

* পলাশ বৃক্ষ—।

মুসলমান শাসনকর্ত্তা আলাউদ্দিন ইসমাইলখাঁ এই অঞ্চলে তাঁহার রাজধানীর স্থান ঠিক করিতে আসিয়া, এই স্থান-টিকেই রাজধানীর উপযুক্ত মনে করেন। ঐ সময় এখানে একদল হিন্দু তাহাদের কোন দেবতার পূজা করিতেছিল এবং সেই উপলক্ষে ঢাকের বাদ্য হইতে ছিল। ইসমাইলখাঁর মনে হঠাৎ এক ভাবের উদয় হইল। তিনি ঢাকবাদক দিগকে একত্র করিয়া, তাহাদিগকে যথা-শক্তি বাজাইতে বলিলেন এবং তিনজন অনুচরকে নিশান হস্তে পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিমদিকে পাঠাইয়া, যতদূর পর্য্যন্ত ঢাকের বাদ্য শুনা যায় ততদূর পর্য্যন্ত যাইয়া নিশান পুঁতিতে আদেশ দিলেন। ইহা হইতে তিনি ঐ স্থানের নাম ঢাকা রাখিলেন। ইসমাইলখাঁ যেখানে প্রথম অব-তরণ করেন সেই স্থানকে এখনও "ইসলামপুর" বলে।

যতদূর জানা যায় তাহাতে উক্ত ইসমাইলখাঁই ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রথম মুসলমান রাজধানীর সূত্রপাত করেন। ঐ সময় হইতেই এই স্থানের উন্নতি হইতে থাকে। ঢাকা ১৭০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অধিকাংশ সময়ই বাঙ্গলার রাজধানী ছিল। তৎপর ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ও ইহা একপ্রকার বাঙ্গলার দ্বিতীয় রাজধানী ছিল।

ঢাকা বাঙ্গলা দেশের দ্বিতীয় সহর। নগরের লোক সংখ্যা প্রায় একলক্ষ। ঢাকা চিরকালই উৎকৃষ্ট কাপড়ের জন্য বিখ্যাত। এখানকার সুচিক্কণ "মসলিন" নামক কাপড় সমস্ত পৃথিবীতে পরিচিত। ঢাকাতে নানাপ্রকার শাঁখার ও সোণারূপার সুন্দর সুন্দর দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

ঢাকা নগরীতে নিম্ন লিখিত স্থানগুলি দর্শনীয় বটে ঃ—লাটসাহেবের বাড়ী, রমনার বিবিধ গবর্ণমেণ্ট আফিস বাড়ী, কার্জ্জন হল, ঢাকা কলেজ, হুসনীদালান, ঢাকেশ্বরীর বাড়ী, নবাব সাহেবের "আসান মঞ্জিল" বাড়ী, পুরাতন লালবাগের কেল্লা, লোহারপুল ইত্যাদি।

মাতৃভক্তি—আলেকজেণ্ডার।

আলেকজেণ্ডার গ্রীসদেশের অন্তর্গতঃ মাসিডোনের রাজা ছিলেন। ইনি অতি বীর-পুরুষ বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। পৃথিবীর বহুদেশ জয় করিয়া ইনি "দিগ্বিজয়ী আলেকজেণ্ডার" নাম পাইয়া ছিলেন। ইহার ভয়ে সর্ব্বদা পৃথিবীর লোক কম্পিত থাকিত।

মহাবীর আলেকজেণ্ডারের মাতার নাম অলিম্পিয়াস ছিল। অলিম্পিয়াস বড় ক্ষমতাপ্রিয়া স্ত্রীলোক ছিলেন।

পুত্রের অনেক কার্য্যে তিনি সময় সময় হস্তক্ষেপ করিতে চাহিতেন। এইজন্য আলেকজেণ্ডার অনেক সময় বিরক্ত হইতেন। কিন্তু মাতা এসংসারে মানবের পরম পূজনীয়া জানিয়া, আলেকজেণ্ডার কদাপি তাঁহাকে কোন কটু কথা বলিতেন না; কেবল তিনি তাঁহাকে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতেন যে রাজকার্য্যে তিনি যেন কোন রূপ বাধা না জন্মান। কিন্তু অলিম্পিয়াস পুত্রের কথা মত প্রায়ই চলিতেন না। মাতৃভক্ত আলেকজেণ্ডার মায়ের সঙ্গে এই জন্য আর বাড়াবাড়ি করিতেন না।

এণ্টিপেটার নামক এক ব্যক্তি আলেকজেণ্ডারের প্রধান রাজ্যশাসকের পদে নিযুক্ত ছিলেন; এই এণ্টিপেটার একবার আলেকজেণ্ডারের নিকট একপত্রে বিশেষরূপে জানাইলেন, যে তাঁহার মাতা এণ্টিপেটারকে বড়ই যন্ত্রণা দিতেছেন। আলেকজেণ্ডার এই পত্র পাইয়া অনুচরগণের নিকট বলিলেন, এণ্টিপেটার জানেনা যে আমার মায়ের একবিন্দু চক্ষের জল এইরূপ শত শত পত্র মুছিয়া ফেলিতে পারে।”

কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিন্‌গেল।

কুমারী নাইটিন্‌গেল ইংলণ্ড দেশীয় একজন ধনীর কন্যা ছিলেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে তাঁহার জন্ম হয়। ইনি অতি বুদ্ধিমতী ও দয়াশীলা নারী ছিলেন। ইঁহার সমস্ত জীবন নিঃস্বার্থভাবে পরের সেবায় অতিবাহিত করিয়া ইনি এই পৃথিবীতে দেবীতুল্যা হইয়া গিয়াছেন।

নাইটিন্‌গেলের পিতা বাল্যকালেই কন্যাকে ভালরূপে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কন্যাও বিশেষ মনোযোগ সহকারে নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন এবং অচিরে তিনি সাহিত্য, গণিত, সঙ্গীত, সূচিকার্য্য ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিলেন। কিন্তু যে শ্রেষ্ঠগুণে তিনি রমণীকুলের শিরোমণি বলিয়া পৃথিবীতে পূজিতা হইয়াছিলেন, তাহার বিকাশ তাঁহার বাল্য জীবনেই পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তিনি শিশুকালে তাঁহার পিতার জনৈক ধর্ম্মযাজক বন্ধুর সহিত নানাস্থানে পীড়িত ব্যক্তিদিগকে দেখিতে যাইতেন এবং ইহাতে তিনি বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেন। পীড়িত ব্যক্তিগণের কষ্ট দেখিয়া দয়াবতী নাইটিন্‌গেলের প্রাণ

গলিয়া যাইত এবং তাহাদের কষ্ট দূর করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত।

কুমারী নাইটিন্‌গেলের বাল্যজীবনের একটি গল্প, এইরূপ প্রচলিত আছে যে জনৈক মেষপালকের একটি আহত কুকুর দেখিয়া তাঁহার বড় দুঃখ হয় এবং তিনি ঐ কুকুরটির সেবায় নিযুক্ত হয়েন। তিনি প্রত্যহ নিজের হাতে কুকুরটির ক্ষতস্থান ধৌত করিতেন ও বাঁধিয়া দিতেন। ক্রমে তাঁহার যত্নে কুকুরটি আরোগ্য লাভ করে।

ক্রমেই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুমারী নাইটিনগেলের আর্ত্ত-সেবার স্বাভাবিক ভাব প্রকাশিত হইতে লাগিল তিনি 'কেইসারওয়ার্থ' নামক স্থানের "প্যষ্টারইনিষ্টি-টিউসানে" যাইয়া রোগিপরিচর্য্যার নিয়মাদি শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই সময় তিনি নানাস্থানে ঘুরিয়াও বহুচিকিৎসালয়ে সেবাকার্য্য পরিলক্ষণ করিয়া ছিলেন। যাহাহউক কিছুদিন তিনি 'কেইসার-ওয়ার্থে' থাকিয়া পরে ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারিস-নগরে গমন করেন এবং সেখানে অনেক দিন বাস করিয়া নাইটিন্‌গেল আর্ত্তসেবার কার্য্যপ্রণালী বিশেষরূপে শিক্ষা করেন। ইহার পর তিনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া

সেখানকার আতুর স্ত্রীলোকগণের সেবাকার্য্যে কতক কাল অতিবাহিত করেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে বৃটিশ ও রুশ দুইপক্ষ ছিলেন। ঐ যুদ্ধে বহু সৈন্য আহত হইতে লাগিল। তাহাদের যন্ত্রণার পরিসীমা ছিল না। সৈন্যগণের ঐ কষ্টের কাহিনী শুনিয়া পরদুঃখকাতরা নাইটিন্‌গেলের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাইয়া আহত সৈন্যগণের সেবা করিতে যুদ্ধমন্ত্রীর অনুমতি গ্রহণ করিলেন। আত্মীয় পরিজনের মমতা তাঁহাকে বাধাদিতে পারিল না, দূরদেশে যুদ্ধ ক্ষেত্রের ভয়ে তিনি ভীত হইলেন না। একমাত্র পরের কষ্ট দূর করিতে তিনি সকল বাধাবিঘ্ন পায় ঠেলিয়া স্বদেশ হইতে যাত্রা করিলেন।

নাইটিনগেল অতি অল্পসংখ্যক কতিপয় ধাত্রী সঙ্গে লইয়া ক্রিমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। সেখানে স্কুটারি নগরে একটি চিকিৎসালয় স্থাপিত হইল। এইবার করুণাস্বরূপিণী নাইটিন্‌গেল অসীম উৎসাহে আপনার চিরবাঞ্ছিত পথে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আহার নিদ্রা বড় একটা রহিল না তিনি সংসার ভুলিয়া গেলেন, নিজের জীবনের প্রতিও তাঁহার মমতা রহিলনা।

তিনি আর্ত্ত-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিলেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাইটিন্‌গেল দিবারাত্র কেবল আহত সেনাগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিলেন। তিনি নিজের হাতে তাহাদের মলমূত্র ফেলিতেন, ক্ষত ধৌত ও পথ্য দান করিতেন এবং তাহাদের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া মাতার মত শুশ্রূষা করিতেন ও প্রবোধবাক্য বলিতেন। তাঁহার যত্নে ও মধুর বাক্যে আহত সৈনিকগণ সময় সময় তাঁহাকে স্বর্গীয় দেবী বলিয়া মনে করিত। কি নিঃস্বার্থ পরোপকার!

কুমারী নাইটিন্‌গেল যখন ঐ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্বদেশে ফিরিতে ছিলেন, তখন ইংলণ্ডবাসিগণ তাঁহাকে বিশেষ আড়ম্বরে অভ্যর্থনার আয়োজন করিতেছিল। কিন্তু নাইটিন্‌গেল তাহাতে অসম্মত হইলেন। যাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা উচ্চতর স্বর্গীয়ভাবে পূর্ণ রহে, তাঁহার নিকট সংসারের অসার জাঁকজমক ভাল লাগিবে কেন? তিনি নীরবে ইংলণ্ডের রাজপথ দিয়া আপনার বাসস্থানে চলিয়া গেলেন। বহুকাল হইল নাইটিন্‌গেল পরলোক গমন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি মরিয়াও অমর হইয়া রহিয়াছেন, কেননা জগতবাসী এখনও তাঁহার স্মৃতিকে বিশেষভাবে ভক্তি করিয়া থাকে এবং চিরকালই করিবে।

অর্থের সদ্ব্যবহার—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সি-আই-ই

বাঙ্গলাদেশের গৌরব, বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতার নাম ভগবতী দেবী।

ঠাকুরদাস সামান্য বেতনে কলিকাতায় চাকুরি করিতেন, বিদেশে পরিবার নিয়া থাকিবার সঙ্গতি তাঁহার ছিল না। কাজেই ঈশ্বরচন্দ্র শিশুকালে গ্রাম্য পাঠশালায় তৎকাল প্রচলিত বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষা করেন। কিন্তু ঠাকুরদাস সামান্য বেতনে চাকুরি করিলেও, পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তাঁহার যত্নের ত্রুটি ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স যখন নয়বৎসর, তখন ঠাকুরদাস তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া, গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃতকলেজে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। বিদ্যাশিক্ষার প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকাল হইতেই বিশেষ মনোযোগ ও আগ্রহ ছিল। ইহার জন্য তিনি যেমন অতিশয় যত্ন করিতেন, তেমনই পরিশ্রম করিতেন। তাহার ফলে তিনি প্রতিবারেই বার্ষিক পরী[illegible] [illegible] পারদর্শিতা

প্রদর্শন করিয়া, সর্ব্বোচ্চ পারিতোষিক পাইতে লাগিলেন। এইরূপে অল্প সময়েই তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য, স্মৃতি, অলঙ্কার ও ন্যায় ইত্যাদি বিবিধ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি "বিদ্যাসাগর" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, ও কলেজ পরিত্যাগ করেন। ইহার পরে তিনি ইংরেজী ভাষাও ভালরূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমতঃ কলিকাতার "ফোর্টউইলিয়াম কলেজে" মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে প্রধান পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার অসাধারণ কার্য্যদক্ষতা ও পাণ্ডিত্য গুণে তিনি পরিশেষে মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ ও বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কোন কারণে তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক চাকুরি পরিত্যাগ করেন।

অতঃপর বিদ্যাসাগর মহাশয় "সংস্কৃতপ্রেস ও ডিপজিটরী" নামক পুস্তকের দোকান সংস্থাপিত করেন। এই সময় তিনি বহু পুস্তক রচনা করিতে থাকেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলির অধিকাংশই বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক-রূপে বহুকাল নির্ব্বাচিত ছিল। ইহাতে তাঁহার প্রচুর

পরিমাণ অর্থাগম হইত। কিন্তু তিনি জীবন ভরিয়াই উপার্জ্জিত অর্থ পরহিতকর কার্য্যে ব্যয় করিয়া, দেশে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এই জন্য লোকে তাঁহাকে "দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর" বলিত। এ জগতে অনেকেই অর্থ উপার্জ্জন করেন বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় অর্থের সদ্ব্যবহার অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই করিয়া থাকেন। তিনি নিজের বা নিজ পরিজনের সুখ-স্বচ্ছন্দতার বিষয় হৃদয়ে স্থানই দিতেন না, উপার্জ্জিত অর্থ অকাতরে বিবিধ সৎকার্য্যে জলের মত ব্যয় করিতেন। তাঁহার দানের সীমা ছিল না, তিনি কত লোককে কত ভাবে যে অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যাকরা যায় না। দরিদ্রের দুঃখ দেখিলে-তাঁহার হাতে অর্থ না থাকিলে, তিনি অপরের নিকট হইতে হাওলাত করিয়াও পরের দুঃখ বিদূরিত করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র দেশের বালকগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য বহু অর্থব্যয় করিয়া কলিকাতায় "মেট্রপলিটান কলেজ" স্থাপিত করেন। আপনার জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে তিনি একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া, উহাতে বিনাবেতনে গ্রাম্য বালকগণের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। বিগত ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা-

দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, বিদ্যাসাগর বীরসিংহ গ্রামে অন্নসত্র খুলিয়া প্রায় ছয়মাসকাল সহস্র সহস্র লোককে অন্নদান করিয়া ছিলেন। বাঙ্গালার অদ্বিতীয় অমরকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত তিনি ছয় হাজার টাকা সাহায্য দান করেন। ঈশ্বরচন্দ্র প্রতি বৎসর দুইবার বাড়ীতে যাইতেন, প্রত্যেকবারেই দরিদ্র দিগের জন্য নগদ ৫০০৲ টাকা ও ৫০০৲ টাকার বস্ত্র সঙ্গে লইয়া যাইতেন। তিনি তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে যে "উইল" বা চরমপত্র করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার আত্মীয়-বান্ধব ও দীন দুঃখীদিগের নিমিত্ত মাসিক ৮৪২৲ টাকা মাসিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া ছিলেন।

একদা এক ব্রাহ্মণ আপনার কন্যা-বিবাহ দিতে দুই সহস্র টাকা ঋণ করেন। ব্রাহ্মণ ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হওয়ায়, ঋণদাতা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের উপর সুদসহ ২৪০০৲ টাকার ডিক্রী প্রাপ্ত হয়েন। ঘটনা ক্রমে কোনও স্থানে ঐ ব্রাহ্মণের সহিত বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি ব্রাহ্মণের মুখে তাঁহার বিপদের কথা অবগত হয়েন। ব্রাহ্মণ কিন্তু বিদ্যাসাগরকে চিনিতে পারেন নাই। অতঃপর টাকা দেওয়ার ধার্য্য দিনে ব্রাহ্মণ আদালতে গিয়া জানিলেন

যে, কোন সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহার ঋণের সমস্ত টাকা পরিশোধ করিয়া দিয়াছেন। কি মহানুভবতা! কি অতুলনীয় লোকহিতৈষিতা! পরহিতব্রতই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিরকাল আচরণয়ী ছিল। এই ভাবে তিনি ভিক্ষার্থীকে অর্থ দিয়া, দেশের শতদূঃখ দূর করিয়া ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ৭১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশময় হাহাকার রব উঠিয়া ছিল। তিনি প্রকৃতই দেশের অনাথের নাথ, বিপন্ন-বান্ধব ও নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তিরাজি তাঁহাকে চিরকালের তরে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

অতিথি সেবার ফল।

ইয়োরোপ মহাদেশের রুশিয়া রাজ্যে জার আইভান নামে এক বিখ্যাত সম্রাট্ রাজত্ব করিতেন। তিনি বড় ধার্ম্মিক, দয়ালু ও প্রজারঞ্জক নরপতি ছিলেন। প্রজাগণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য তিনি অনেক সময় ছদ্মবেশে রাজ্য মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

এক সময়ে তিনি মস্কো নগরের নিকটে বেড়াইতে বেড়াইতে রাত্রিকালে একাকী এক গ্রামে প্রবেশ করিলেন। সম্রাট্ সামান্য বেশে বাহির হইয়া ছিলেন, কাজেই তাঁহার প্রতি কাহারও কোন প্রকার বিশেষ

লক্ষ্য হইল না। তিনি একে একে গ্রামের অনেকগুলি বাড়ীতে যাইয়া অতিকাতরভাবে রাত্রিযাপনের নিমিত্ত আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। সম্রাট্ রাজধানী হইতে একটুকু দূরে সরিয়া পড়িয়াছিলেন, কাজেই তিনি আশ্রয় পাইবার জন্য কতকটা ব্যতিব্যস্তই হইয়া পড়িলেন। জার-আইভান আপনার কর্ত্তব্য বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে নিকটবর্ত্তী এক কুটীরের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। ঐ কুটিরে গ্রামের একটি অতি দরিদ্র পরিবার বাস করিত।

সম্রাট্ নিরুপায় হইয়া ঐ কুটিরের নিকট অগ্রসর হইলেন এবং কাতরভাবে গৃহস্বামীর নিকট ঐ রাত্রির জন্য একটুকু আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। গৃহস্বামী একে দরিদ্র, তাহাতে তাহার স্ত্রী অতিশয় পীড়িতা ছিল। কিন্তু সে জানিত যে নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান ও অতিথি-সেবা করা মানুষ মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। তাই সে নিতান্ত কাতরভাবে আগন্তুক ছদ্মবেশি-সম্রাটকে কহিল, "মহাশয়, আমি দীন হীন, তাহাতে আমার পত্নী রোগে কাতরা। আপনাকে বড় কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকিতে হইবে। দয়া করিয়া গৃহের ভিতরে আসুন, বাহিরে

দাঁড়াইয়া আর কষ্ট পাইবেন না।” সম্রাট্ ঐ দরিদ্র গৃহস্বামীর ব্যবহারে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “ভাই, আমার জন্য তোমার কিছুই ভাবিতে হইবে না। এই অসময়ে আমি তোমার নিকট আশ্রয় পাইয়াই যথেষ্ট কৃতার্থ হইলাম,”। অতঃপর গৃহস্বামী সম্রাটকে বালক বালিকাগণের থাকিবার কক্ষে লইয়া গেল।

ইহার পর গৃহস্বামী সামান্য কিছু খাবার আনিয়া সম্রাটের নিকট উপস্থিত করিল। সম্রাট্ প্রথমে কিছু খাইতেই চাহিলেন না। কিন্তু পরে তিনি গৃহ-স্বামীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে সামান্য কিছু আহার করিলেন। এই সময় গৃহস্বামী তাহার একটি শিশু পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া সম্রাটের নিকট দাঁড়াইলে, সম্রাট্ আদর করিয়া বালকটির মুখচুম্বন পূর্ব্বক বলিলেন, “এই বালক নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে বড় লোক হইবে।” তাহার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে খৃষ্টানদের ধর্ম্মের নিয়ম মতে ঐ বালককে দীক্ষিত করা হইয়াছে কিনা। গৃহস্বামী তাহাতে বলিলেন যে, তাহার পর দিনই বালককে গির্জ্জায় নিয়া দীক্ষিত করা হইবে। সম্রাট্ তাহা শুনিয়া গৃহস্বামীকে কহিলেন যে, তিনি বালকের দীক্ষার সময় গির্জ্জায় উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছা করেন, কাজেই সে যেন

তাঁহার জন্য একটুকু অপেক্ষা করে। সম্রাটের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে গৃহস্বামী ইহাতে সম্মত হইল। তৎপর সকলে বিশ্রাম লাভ করিল। পরদিন অতিভোরে সম্রাট্ গৃহস্বামীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

কিছুকাল গত হইলে, গৃহস্বামী তাহার শিশু পুত্রটিকে লইয়া গির্জ্জায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ইত্যবসরে সে তাহার বাড়ীর নিকট গাড়ী, ঘোড়ার শব্দ শুনিতে পাইল। গৃহস্বামী বাহির হইয়া দেখিল যে, তাহারই বাড়ীর দিকে বহু লোক ও গাড়ী ঘোড়া ইত্যাদি আসিতেছে। ইহা দেখিয়া সে ক্ষণকাল কিছুই বুঝিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে একটা জাঁকজমক পূর্ণ গাড়ী তাহার দ্বারে আসিয়া থামিল এবং তাহা হইতে এক বহুমূল্য পরিচ্ছদধারী ভদ্রলোক নামিয়া গৃহস্বামীকে বলিল, "আমি আমার কথামত কার্য্য করিতে আসিয়াছি, চল তোমার শিশু পুত্রকে নিয়া গির্জ্জায় যাই। কল্য রাত্রিতে তুমি তোমার অতিথি সেবার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছ, আজ আমি রাজার কর্ত্তব্য পালন করিতে আসিয়াছি।" গৃহস্বামী তখন জানিল যে পূর্ব্ব রাত্রির অতিথিই, তাহার সম্মুখে উপস্থিত রুশরাজ্যের প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট।

তখন সে বিস্ময়ে ও ভয়ে অবাক্ হইয়া রহিল। সম্রাট্ তাহার হাতে ধরিয়া কহিলেন যে তাহার কোনও ভাবনার কারণ নাই; সে যে সৎকার্য্য পূর্ব্বরাত্রিতে করিয়াছে, তাহার অবশ্যই পুরস্কার হইবে।

ইহার পর সম্রাট্ উক্ত গৃহস্বামী ও তাহার শিশুপুত্র প্রভৃতিকে নিয়া গির্জ্জায় চলিয়া গেলেন এবং সেখানে বালকের দীক্ষার কার্য্য শেষ হইলে, তিনি তাহার ভরণ-পোষণ ও শিক্ষার সমস্ত ভারই নিজে গ্রহণ করিলেন। এইরূপে অতিথিসেবার উপযুক্ত পুরস্কার হইল।

পক্ষী।

জগতে যত জীব আছে তাহাদের মধ্যে পক্ষিজাতি বড় সুন্দর। পাখীর শরীর পালকে ঢাকা। কোন কোন পাখীর পালক এমন সুন্দর যে, তাহা দেখিলে সৃষ্টিকর্ত্তার অপার মহিমা আপনা হইতে হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। ময়ূর, মোরগ, কাকাতুয়া প্রভৃতি এই শ্রেণীর পাখী বটে। অষ্ট্রেলিয়া দেশে এক প্রকারের পাখী আছে, তাহাদের

লেজ অতি সুন্দর, এই জন্য উহাদিগের নাম "প্যারে-ডাইজ্ বার্ড" বা স্বর্গের পাখী।

তিন প্রকারের পাখী আছে; যথা খেচর, ভূচর ও জলচর। যে সকল পাখী আকাশে উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে খেচর পাখী বলাযায়; যেমন চিল, বাজ প্রভৃতি। কতকগুলি পাখী মৃত্তিকার উপরে চড়িয়া ফিরে, তাহারা আকাশে উড়িতে পারে না। উহাদিগকে ভূচর পাখী বলা যায়, যেমন মোরগ প্রভৃতি। যে সকল পাখী জলে বাস করে, তাহাদিগকে জলচর পাখী বলা হয়, যথা ডাহুক প্রভৃতি।

পক্ষিগণ ডানার সাহায্যে একস্থান হইতে অন্য স্থানে উড়িয়া যাইতে পারে। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই, কোকিল, বৌকথাকও প্রভৃতি পাখীরা বৎসরের কোন কোন সময়ে আমাদের দেশে আসে, আবার কোন কোন সময়ে চলিয়া যায়। এই জাতীয় পক্ষীকে ভ্রমণকারী পাখী বলা যায়।

শকুনি, গৃধিনী প্রভৃতি কতকগুলি পাখী আছে, উহারা মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করে। ঈগল নামে এক প্রকার পাখী আছে; উহাদের আকার বৃহৎ এবং শরীরে এত বল যে, উহারা মেষশাবক, ছাগ প্রভৃতি ছোঁ মারিয়া

লইয়া উড়িতে পারে। আফ্রিকা দেশে 'উটপাখী নামক এক প্রকার বৃহৎ পাখী দেখা যায়। উহাদের দেহের এত বল যে ঘোড়া যেমন মানুষকে অনাসে বহন করে, উহারাও সেইরূপ মানুষকে বহন করিতে পারে।

পক্ষীদিগকে সাধারণতঃ এই কএক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, ; যথা—সন্তরণকারী, কর্দ্দমকারী, খননকারী, শাখাবিহারী ও শিকারী।

হাঁস, রাজহাঁস প্রভৃতি সন্তরণকারী পাখী। উহারা অধিকাংশ সময় জলে থাকিলেও ডুব দিয়া খাদ্য ধরিতে পারে না। বক, সারস প্রভৃতি পক্ষিগণ পুকুর, নদী বা জলাভূমির নিকট ঝোপের মধ্যে বাস করে। উহারা সাঁতার কাটিতে পারে না। উহাদের পা খুব লম্বা, কাজেই উহারা অল্প জলের মধ্য দিয়া হাটিয়া যাইয়া খাদ্য সংগ্রহ করে। উহাদিগকে কর্দ্দমকারী পাখী বলা হয়। আমরা সচরাচর পারাবত, মোরগ প্রভৃতি যে সকল গৃহ পালিত পক্ষী দেখিতে পাই, উহাদিগকে খননকারী পাখী বলা যায়। উহারা নখরদ্বারা মাটী খুঁড়িয়া পোকা ও নানাবিধ শস্যের কণা আহার করে। পাখীদের মধ্যে অধিকাংশই শাখাবিহারী। উহারা বৃক্ষের শাখায় বাসা প্রস্তুত করিয়া বাস করে; যথা—কাক, শালিক, ঘুঘু

প্রভৃতি। শিকারী পাখীদের মধ্যে শকুনি, ঈগল প্রভৃতির বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। উহারা নখর ও ঠোঁটের সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব ধরিয়া ভক্ষণ করে।

ন্যায়বান রাজা ও নিরপেক্ষ বিচারক।

মুসলমান রাজত্বের সময়ে সুলতান গিয়াসউদ্দিন নামক এক নরপতি কতক কাল এই বাঙ্গালাদেশ শাসন করিয়া ছিলেন। তাঁহার নানাপ্রকার সদ্‌গুণে তিনি সর্ব্বসাধারণের বড়ই প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন শর-চালনা বিদ্যায় বিশেষ পটু ছিলেন। তিনি প্রায়ই অনুচরগণকে সঙ্গে লইয়া নানা স্থানে শিকার করিতে যাইতেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন এক সময়ে শিকারে বাহির হইয়া, কোনও স্থানে একটা ঝোপের আঁড়ালে একটি সুন্দর পক্ষী দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ পাখীটিকে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া গেল, শরটি এক দরিদ্র বৃদ্ধার একমাত্র পুত্রের শরীরে বিদ্ধ হইল। শরের আঘাতে বালকটিকে ভূতলে পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতে দেখিয়া, তাহার

বৃদ্ধা মাতা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। সুলতানও এই ঘটনায় বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন।

অসহায়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি শোকে ও ক্রোধে জর্জ্জরিত হইয়া বিচারালয়ে উপস্থিত হইল এবং বিচারপতির নিকট সুলতানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিল।

ঐ সময় সিরাজউদ্দিন নামক এক নিরপেক্ষ প্রবীণ বিচারক দেশের বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিতেছিলেন। যাঁহার অধীনে এবং যাঁহার কৃপায় সিরাজউদ্দিন বিচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, দেশের রাজা সেই সুলতানের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাইয়া, তিনি কিছু মাত্র বিচলিত হইলেন না। তেজস্বি-বিচারক অবিলম্বে সুলতানকে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে আদেশ করিয়া লিপি পাঠাইলেন

নির্দ্দিষ্ট দিনে ন্যায়পরায়ণ সুলতান তাঁহার পরিচ্ছদ মধ্যে একখানা তরবারি লুক্কায়িত রাখিয়া, সাধারণ লোকের মত বিচারালয়ে উপস্থিত হইলেন। সিরাজউদ্দিন নির্ভয়ে তাঁহার আসনে যথারীতি উপবিষ্ট রহিলেন, তিনি সুলতানের কোনরূপ অভ্যর্থনা করিলেন না।

ইহার পর বিচারকার্য্য চলিতে লাগিল। সিরাজউদ্দিন সমস্ত অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া, গম্ভীর ভাবে সুলতানকে

বলিলেন, "আপনি এই অসহায়া বিধবার পুত্রকে আহত করিয়াছেন। আপনি অজ্ঞানতা বশে উহা করায় যদিও গুরুতর দণ্ডের পাত্র নহেন, তথাপি আপনাকে এই বৃদ্ধার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। 'সুলতান' বিচারপতির আদেশ পালন করিলেন। বৃদ্ধা চলিয়া গেল।

ইহার পর সিরাজউদ্দিন সুলতানের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। তখন গিয়াসউদ্দিন তাঁহার পরিচ্ছদ মধ্য হইতে তরবারি বাহির করিয়া বিচারককে বলিলেন "আপনি আমার ভয়ে ভীত হইয়া যদি এইরূপ সুবিচার না করিতেন, তবে তরবারি দ্বারা আপনার প্রাণ লইতাম।" তখন গিয়াসউদ্দিন বলিলেন, বিচারকার্য্যে রাজা ও প্রজা সকলেই সমান আপনি আমার আদেশ না মানিলে, আপনাকে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিতাম।"

দেশের রাজার এইরূপ ন্যায়পরায়ণতা ও বিচারকের এইরূপ নিরপেক্ষতা দর্শনে সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

প্রভুভক্তি—ধাত্রী পান্না।

এই ভারতবর্ষে রাজপুতানা প্রদেশে রাণাসঙ্গ নামক একব্যক্তি চিতোরের রাজা ছিলেন। কালক্রমে তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র বিক্রমজিৎ চিতোরের রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। বিক্রমজিৎ কিছুকাল রাজত্ব করিলে পর, বনবীর নামক একব্যক্তি বলপূর্ব্বক বিক্রমজিৎকে তাড়াইয়া দিয়া, চিতোরের সিংহাসন অধিকৃত করেন। ইহার পর বনবীর বিক্রমজিৎকে একেবারে নিহত করিয়া তাঁহার রাজসিংহাসন নিরাপদ্ করিয়াছিলেন।

বিক্রমজিতের উদয়সিংহ নামে ছয়বৎসর বয়স্ক এক শিশু ভ্রাতা ছিল। ধাত্রী পান্না ঐ শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ করিত। বনবীর ভাবিলেন যে ঐ শিশু বড় হইয়া, তাঁহার রাজপদের শত্রু হইতে পারে। এই নিমিত্ত তিনি উদয় সিংহের প্রাণ বিনষ্ট করিতে সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

ধাত্রী পান্না একদিবস রাত্রিতে শিশু উদয়সিংহকে নিয়া রাজবাড়ীর অন্তঃপুরে বিশ্রাম করিতে ছিল। তাহার নিকট তাহার নিজের পুত্রটিও ছিল। হঠাৎ একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল এবং পান্না শুনিতে পাইল যে

বনবীর শিশু রাজকুমার উদয়সিংহকে বধ করিতে আসিতেছেন। ধাত্রী এই সংবাদে একেবারে অধীরা হইয়াপড়িল। নিজ পুত্রের ভাবনা তাহার বড় আসিল না, কিন্তু কিরূপে রাজকুমারের প্রাণ রক্ষা হইবে এই চিন্তায়ই ধাত্রী ব্যাকুলা হইয়া পড়িল। পান্না তখন কুমারকে একটা ফলের ঝুড়ীতে স্থাপিত করিয়া, কতকগুলি পাতা দ্বারা তাহা ঢাকিল এবং একজন বিশ্বস্ত ভৃত্যদ্বারা ঝুড়ীটি রাজবাড়ীর বাহিরে পাঠাইয়া দিল। ইত্যবসরে বনবীর আসিয়া ধাত্রীকে কুমার উদয়সিংহের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। পান্না ভয়ে কিছুই বলিতে পারিল না। তখন বনবীর ক্রোধে বিশেষ তর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং ধাত্রীপুত্রকেই রাজকুমার উদয়সিংহ মনে করিয়া, তাহার প্রাণবধ পূর্ব্বক বেগে প্রস্থান করিলেন। অতিদ্রুত এই ঘটনা ঘটিল। নিজপুত্রের মৃত্যুতে ধাত্রী পান্না কাতর হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু রাজকুমারের প্রাণ রক্ষা হওয়ায়, সে আপনার দারুণ দুঃখের সময়ও অনেকটা আশ্বস্ত হইতে পারিল।

ধাত্রী পান্নার এই অতুলনীয় প্রভুভক্তির দৃষ্টান্তে সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছিল। এই কার্য্যে পান্নার নাম পৃথিবীতে চিরস্মরণীয়া হইয়া রহিয়াছে।

ইংরেজ শাসনের সুফল।

ভারতের মঙ্গলের জন্যই পরমেশ্বর ইংরেজজাতিকে এদেশের রাজত্ব প্রদান করিয়াছেন। ইংরেজ শাসনে আমরা সকল প্রকার সুখ-ভোগ করিতে পারিতেছি। পূর্ব্বে এদেশে নানাবিধ অশান্তি বিদ্যমান ছিল। চোর ডাকাইতের ভয়ে, রাত্রিতে লোকের শান্তিতে নিদ্রা হইত না। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাজাদের মধ্যে সর্ব্বদা বিরোধ ও যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিত। তাহার ফলে দেশের লোকের ধনপ্রাণ নিরাপদ ছিল না, কারণ বিজয়ি-রাজা শত্রুর রাজ্য লুণ্ঠন ও প্রজাগণের প্রাণনাশ করিত। সময় সময় বিদেশ হইতেও লুণ্ঠনকারিগণ এদেশে প্রবেশ করিয়া, দেশ উৎসন্ন করিয়া চলিয়া যাইত। ইংরেজগণ দেশের সেই সকল অশান্তি দূর করিয়াছেন। এখন আর বিদেশী লুণ্ঠনকারীর অত্যাচার নাই। বিভিন্ন প্রদেশের রাজগণও পরস্পর শত্রুতা ভুলিয়া, এখন নির্ব্বিবাদে আপন আপন দেশ শাসন করিতেছেন। পূর্ব্বে এদেশে ঠগ, পিণ্ডারী, বর্গী প্রভৃতি দস্যুগণের ভীষণ অত্যাচার ছিল। ঐ সকল দস্যু ভয়ে লোকে নিরাপদ থাকিতে পারিত না। তাহাদের অত্যাচারে লোকের পথে

চলা দায় হইত। এখন আর সেই সকল অত্যাচারের ভয় নাই।

ইংরেজরাজত্বের ফলে এদেশের শিল্পবাণিজ্যের বহু উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্বে এদেশের উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে প্রেরণ করিবার তেমন সুবিধা ছিল না। এখন উহা বিদেশে নীত হইয়া, উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। পরন্তু, ভিন্ন দেশীয় যে সকল দ্রব্য পূর্ব্বে এদেশে আসিত না, সেই সকল দ্রব্য এখন অনায়াসে ভারতের সকল স্থানে পাওয়া যায়। বিলাতের মহাজনগণের মুলধনে এদেশে পাট, তুলা, কাগজ প্রভৃতির বহু কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে। তাহাদের যত্নে পতিতভূমিসমূহে এখন চা ও নীল প্রভৃতি দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে। পাথুরিয়াকয়লার খনিতে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ঐ সকল কলকারখানায় নিযুক্ত হইয়া এদেশের হাজার হাজার লোক অন্নের সংস্থান করিতেছে। ইংরেজগণ যাতায়াতের সুবিধা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তারের নিমিত্ত, এদেশে রেলগাড়ী ও ষ্টীমার চালাইতেছেন। পূর্ব্বে একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে লোকের অতিশয় কষ্ট স্বীকার ও বহু অর্থব্যয় করিতে হইত। এখন ষ্টীমার ও রেলগাড়ীর সাহায্যে লোকে অল্প খরচে, অতি দীর্ঘ পথ অল্প সময়ে অতিক্রম করিতে পারে এবং বাণিজ্যদ্রব্যাদিও অতি

সহজে একস্থান হইতে অন্য স্থানে পাঠান যায়। ভারতের কোন অংশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, অল্প সময় মধ্যে সেই স্থানে খাদ্য শস্যাদি পাঠাইয়া লোকের প্রাণ রক্ষা করা যায়। আবার যাতায়াতের সুবিধা হেতু, ভিন্ন ভিন্ন দেশের নানা জাতির লোক একস্থানে মিলিত হইতেছে। ফলে তাহাদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে বন্ধুত্ব বাড়িতেছে।

ডাক ও টেলিগ্রাফ-বিভাগ স্থাপিত করিয়া ইংরেজগণ এদেশের অশেষ মঙ্গল সাধিত করিয়াছেন। পূর্ব্বে বাহকের সাহায্যে দূরবর্ত্তী স্থানের খবর লইতে হইত, তাহা অতি ব্যয়সাধ্য ছিল। ডাকটিকেট প্রচলিত হওয়ায়, এক পয়সা ব্যয়ে আমরা ভারতের যে কোন স্থানের খবর লইতে পারি। টেলিগ্রাফের সাহায্যে মুহূর্ত্তমধ্যে অতি দূরবর্ত্তী স্থানে সংবাদ পাঠাইতে পারি।

এদেশের প্রজাগণের স্বাস্থ্যরক্ষা ও তাহার উন্নতির জন্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। অনেক বড় সহরেই বহুঅর্থব্যয়ে নির্ম্মল জল যোগাইবার ব্যবস্থা করিয়া, পাণীয় জলের অভাব ও দোষ দূর করিয়াছেন। রাজপথ আলোকিত করিবার, আবর্জ্জনা দূর করিবার ও জল নিঃসারণের সুব্যবস্থা করিয়াছেন। স্থানে স্থানে হাসপাতাল ও দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন ও বিচক্ষণ

চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া, পীড়িত ব্যক্তির চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কোন স্থানে মহামারী উপস্থিত হইলে, গবর্ণমেণ্ট তাহা নিবারণের নিমিত্ত বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়া থাকেন।

আমাদের দেশের লোকের শিক্ষার নিমিত্ত, ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট স্কুল ও কলেজসমূহ স্থাপিত করিয়াছেন। ঐ বিদ্যালয়ে সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মের বালক ও যুবকগণ একত্রভাবে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি সকল বিষয়েরই শিক্ষার সুবিধা হইয়াছে। ইংরেজী ভাষা এদেশের একটি প্রধান সম্পদ্ হইয়াছে। ইংরেজীর সাহায্যে আমরা সমস্ত সভ্য দেশের লোকের সহিত কথোপকথন করিতে পারি। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের লিখিত অমূল্য গ্রন্থসকল পাঠ করিয়া, আমরা জ্ঞান লাভ করিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশীয় ভাষাগুলিরও বিশেষরূপ উন্নতি সাধিত করিতে পারিতেছি।

ইংরেজের রাজত্বে অবিচার নাই। এখন আর দুর্ব্বলের প্রতি কেহ অত্যাচার করিতে পারে না। ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ সকলেই সমানভাবে রাজদ্বারে আপন আপন অভিযোগের প্রতিকার পাইয়া থাকে। নিতান্ত

হীন ব্যক্তিও বিনা বিচারে শাস্তি পাইতে পারে না। ধর্ম্ম বিষয়েও সর্ব্বসাধারণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। সকলেই ইচ্ছানুরূপ ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে পারিতেছে। একের ধর্ম্ম বিশ্বাসে অন্য হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। ইংরেজের শাসনে এ দেশের বহু কুপ্রথা নিবারিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে এদেশে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। লোকে পুথিসকল হাতে লিখিয়া লইত। তাহা অতিশয় কষ্টসাধ্য ছিল। ইংরেজগণই এদেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্ত্তন করেন। উহার ফলে এখন আমরা রাশি রাশি পুস্তক পাইতেছি। ফলে সকলেই ইচ্ছামত বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারিতেছে। সংবাদপত্র মুদ্রিত ও প্রচলিত হওয়ায়, আমরা সমস্ত জগতের খবর ঘরে বসিয়া পাইতেছি।

ইংরেজ-শাসনের উপকারিতা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইংরেজ রাজত্বে আমরা সুখে ও শান্তিতে বাস করিতেছি। আমাদের মঙ্গল ও উন্নতির জন্য ইংরেজরাজ সর্ব্বদা সচেষ্ট আছেন। সুতরাং যাহাতে ইংরেজ রাজত্ব এদেশে চিরস্থায়ী হয়, তজ্জন্য ভগবানের নিকট সর্ব্বদা আমাদের প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য।

সরল সন্দর্ভ।

(পদ্যাংশ)।

ঈশ্বর।

সৃজেছেন যিনি এই বিশ্বখানি,
রবি, শশী, তারাদলে ;
যাঁহার ইচ্ছায় জীব সমুদয়
বিরাজে এ মহীতলে।
ফিরাইয়ে আঁখি চৌদিকে যা' দেখি—
সবারি কারণ যিনি,
এ বিপুল ভবে যা' কিছু সম্ভবে,
তা'রি হেতু যিনি জানি।
তিনিই ঈশ্বর দয়ার আকর,
এই অখিলের পতি,
প্রেম-ভক্তি ভরে তাঁর পদ' পরে
রাখিও সতত মতি।

বিদ্যা।

বিদ্যাই অমূল্য ধন বলে সুধীজন,
বিদ্যার সমান ধন নাই ত্রিভুবন।
ধর্ম্ম, অর্থ আদি লাভ হয় বিদ্যাবলে,
মানবের অজ্ঞানতা যায় দূরে চ'লে।
বিদ্যায় গঠন করে মানব জীবন,
পশুর অধম হয় বিদ্যাহীন জন।
বিদ্যাবলে সিদ্ধ হয় সর্ব্ব কার্য্য ভবে,
ভুবন ভরিয়া পূজে বিদ্যাবানে সবে।
বিদ্যা দান করে নরে সর্ব্ববিধ সুখ,
বিদ্যাহীন মানবের ঘটে শুধু দুখ।
বিদ্যা শিক্ষা কর সবে হয়ে একমন,
এ জগতে নাই কিছু বিদ্যার মতন।

সময়।

সময় অমূল্য নিধি এই ভূমণ্ডলে,
চলে গেলে একবার,
ফিরে নাহি আসে আর,
সময়ের মূল্য তাই বুঝহ সকলে।

জলের স্রোতের মত অবিরাম ধারে,
সময় চলিয়া যায়,
কারো পানে নাহি চায়,
ফিরাইতে সাধ্য কারো নাহি চরা চরে।
একটু সময়ো যদি কাট আলস্যেতে,
যেই টুকু যাবে চলে,
সেই টুকু কোন কালে
ফিরে নাহি পাবে আর এই অবনীতে।
সময় থাকিতে তাই নিজ কার্য্য কর,
অসময়ে হায় হায়
করি' যার কাল যায়,
এ সংসারে নাই তার সম মূর্খ নর।

ফুল।

ফুটেছে বাগানে ফুল কিসুন্দর মরি,
ছুটেছে সুবাস রাশি চারিদিক্ ভরি।
'গুণ্-গুণ্-গুণ্' রবে যত অলিকুল
ফিরিতেছে মধুলোভে হইয়ে আকুল।
ফুলের সুগন্ধ নিয়ে বায়ু মন্দ বহে,
ঘুরি ফিরি চতুর্দ্দিকে সব মন মোহে।

শিশুগণে ফুলকুলে তুলি' গাঁথে মালা,
কেহ বা মাথায় পরে, কেহ ভরে ডালা,
বিনা স্বার্থে ফুলগণ পর উপকার
করিতেছে নিশিদিন ভরিয়ে সংসার।
এহেন কুসুমরাশি সৃজন যাঁহার,
তাঁর পদে ভক্তিভরে কর নমস্কার।

প্রার্থনা।

পরমেশ,

তোমা ছাড়া অন্য চিন্তা যেন হৃদে আসেনা,
কুপথে ধাইলে আমি, শাসন করিও তুমি,
অধম বলিয়া মোরে পদ ছাড়া করোনা।
যখন যাহাই করি—তোমা যেন ভুলিনা,
আছ তুমি সর্ব্বস্থানে, ইহা যেন থাকে মনে,
অবোধ বলিয়ে মোরে চরণেতে ঠেলোনা।
তোমা ছাড়া কিছু যেন নাহি করি কামনা,
তুমি মাত্র বট সার, অসার সকল আর,
প্রাণে মোর সদা যেন থাকে এই ধারণা।

আমিতো অজ্ঞান, তব নাহি জানি সাধনা,
হে বিভো কৃপারসিন্ধু, দেও দাসে কৃপাবিন্দু
তোমা বিনা কিছু আর যেন কভু জানি না।

মৃত্যুকালে রাবণের উপদেশ।

দশানন বলে মম সংশয় জীবন।
কহিতে বদনে নাহি নিঃসরে বচন॥
যতক্ষণ বাঁচি প্রাণে আছি সচেতন।
কহিব কিঞ্চিৎ নীতি করহ শ্রবন॥
করিতে উত্তম কর্ম্ম বাঞ্ছা যবে হবে।
আলস্য ত্যজিয়া তাহা তখনি করিবে॥
আলস্যে রাখিলে কর্ম্ম পুন হওয়া ভার।
কহি শুন রঘুনাথ প্রমাণ তাহার॥
একদিন আসি আমি স্বর্গপুর হৈতে।
যমপুরী দৃষ্ট হৈল থাকি নিজ রথে॥
শূন্য হতে দেখিলাম যমের ভুবন।
তিন দ্বারে নানা স্থানে আছে সাধুজন॥
দেখিলাম দক্ষিণেতে পাতকীর থানা।
দিবা কিবা রাত্রি কিছু নাহি যায় জানা॥

অন্ধকারে চৌরাশিটা নরকের কুণ্ড।
তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড॥
পরিত্রাহি ডাকে পাপী বিষম প্রহারে।
না দেয় তুলিতে মাথা যমদূতে মারে॥
তাহা দেখি বড় দয়া হইল মনেতে।
ঘুচাব পাপীর দুঃখ শমনের হাতে॥
পাপীর দুর্গতি আর দেখা নাহি যায়।
এত ভাবি সেই দিন এলেম লঙ্কায়॥
পূরাব নরককুণ্ড নিত্য করি মনে।
আজি কালি করিয়া রহিল বহুদিনে॥
হেলায় রহিল পড়ে না হয় পূরণ।
তারপর তব সঙ্গে বাজিল এ রণ॥
কুণ্ড পূরাইব যবে করিনু মনন।
তখনি পূরালে পূর্ণ হইত সে পণ॥
হেলাতে রাখিনু ফেলে না হইল আর।
মনের সে দুঃখ মনে রহিল আমার॥
আর এক কথা শুন নিবেদন করি।
লবণ সমুদ্র মাঝে স্বর্ণলঙ্কা পুরী॥
একদিন মনেতে হইল এই কথা।
সপ্তটি সমুদ্র সৃষ্টি করেছেন ধাতা॥

দধি দুগ্ধ ঘৃত আদি সমুদ্র থাকিতে।
কেন আছে লবণ সমুদ্র সলিলেতে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আমার করতল।
সিঞ্চিয়া ফেলিব আমি সমুদ্রের জল॥
ক্ষীরোদসমুদ্র এনে রাখিব এখানে।
এই কথা চিরদিন আছে মোর মনে॥
যখন মনেতে হয় মনে করি করি।
অন্য কর্ম্মে থাকি সিন্ধু সিঞ্চিতে না পারি॥
এই রূপ হেলাতে অনেক দিন গেল।
তদন্তর তব সঙ্গে সংগ্রাম বাজিল॥
সমুদ্র সিঞ্চন করা না হইল আর।
মনের সে দুঃখ মনে রহিল আমার॥
অতএব এই কথা শুন রঘুমণি।
মন হলে শুভ কর্ম্ম করিবে তখনি॥
হেলায় রাখিলে কার্য্য পূর্ণ নাহি হয়।
আর এক কথা কহি শুন মহাশয়॥
নাগ নর ভূচর খেচর আদি সর্ব্ব।
ভূত প্রেত পিশাচাদি আছয়ে গন্ধর্ব্ব॥
ব্রহ্মার সৃষ্টিতে আছে জীবগণ যত।
যাইতে অমরপুরে সকলে বাঞ্ছিত॥

সকলের শক্তি নহে যাইতে তথায়।
কেহ কেহ দৈব শক্তি অনুসারে যায়॥
এ শক্তি বিহীন যেবা আছে পৃথিবীতে।
স্বর্গপুরে যাইতে না পারে কদাচিতে॥
মনে মনে সাধ করে যাইতে অমরে।
দৈব শক্তি হীন তারা যাইতে না পারে॥
দেখি দুঃখ তাহাদের ভাবিনু অন্তরে।
কিরূপে যাইতে জীব পারে স্বর্গপুরে॥
অনায়াসে যেতে সব পারে দেবলোকে।
নির্ম্মাব স্বর্গের পথ বিশ্বকর্ম্মা ডেকে॥
করিব এমন পথ সবে যেন উঠে।
পৃথিবী অবধি স্বর্গে করে দিব পৈঠে॥
থাকিবে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি সংসারে পৌরুষ।
ত্রিভুবনে সবে মোর ঘোষিবেক যশ॥
তখনি কর্ত্তেম যদি হৈল যবে মনে।
কোন কালে কার্য্যসিদ্ধি হৈত এত দিনে॥
হেলায় রাখিয়ে হৈল বহুদিন গত।
তারপর তব সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত॥
অতএব শুভ-কর্ম্ম শীঘ্র বৃথা ভাল।
হেলায় রাখিয়া সে বাসনা করা হলো॥

পাপ কর্ম্ম অনেক করেছি চিরদিন।
কহিতে না পারি তনু প্রহারেতে ক্ষীণ॥
আছয়ে অনেক কথা আমার মনেতে।
কত কব রামচন্দ্র তোমার সাক্ষাতে॥
এক কথা কহি রাম দেখ বিদ্যমান।
শূর্পণখার লক্ষণ কাটিল নাক কাণ॥
সেই এসে উপদেশ কহিল আমারে।
তাহার বুদ্ধিতে আমি সীতা আনি হরে॥
শূর্পণখা কান্দিলেক চরণেতে ধরে।
মন হৈল সীতারে হরিয়া আনিবারে॥
একবার ভাবিলাম আপন মনেতে।
আজি নাহি কালি সীতা আনিব পশ্চাতে॥
আবার বিচার করি দেখিলাম ভেবে।
হেলায় রাখিব পাছে আনা নাহি হবে॥
অতএব শীঘ্রগতি হরি আনি সীতে।
সর্ব্বনাশ হৈল মোর সীতার জন্যেতে॥
এক লক্ষ পুত্র মোর সওয়া লক্ষ নাতি।
আপনি মরিনু শেষে লঙ্কা অধিপতি॥
যদি সীতা আনিতাম ভেবে চিন্তে মনে।
তবে কেন সবংশে মরিব তব বাণে॥

হেলাতে না হরি সীতা রাখিতাম ফেলে।
তবে মোর সংহার না হৈত কোন কালে॥

(কীর্ত্তিবাস)

ক্রোধকরা মহাপাপ।

দ্রৌপদীর বাক্য শুনি ধর্ম্ম নরপতি।
করেন উত্তর তার ধর্ম্ম-শাস্ত্রে নীতি॥
ক্রোধ সম পাপ দেবী নাহিক সংসারে।
প্রত্যক্ষ কহি যে ক্রোধ যত পাপ ধরে॥
গুরুলঘু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধ কালে।
অবক্তব্য কথা লোকে ক্রোধ হৈলে বলে॥
আছুক অন্যের কার্য্য আত্মা হয় বৈরী।
বিষ খেয়ে ডুবে মরে অস্ত্র অঙ্গে মারি॥
তে কারণে বুধগণ সদা ক্রোধ তেজে।
অক্রোধী লোকে দেখি সর্ব্ব লোকে পূজে॥
ক্রোধে পাপ ক্রোধে তাপ ক্রোধে কুল ক্ষয়।
ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয় ক্রোধে অপচয়॥
জপ তপ সন্ন্যাস ক্রোধীর অকারণ।
রজোগুণে ক্রোধী বিধি করিল সৃজন॥

হেন ক্রোধ যেই জন জিনিবারে পারে।
ইহ-লোক পরলোক অবহেলে তরে॥
সময়েতে তেজ দেখাইবে সমুচিত।
ক্রোধ মহাপাপ না করিবে কদাচিত।
ক্ষমাসম ধর্ম্ম দেবী অন্য ধর্ম্ম নয়।
পূর্ব্বেতে কশ্যপ মুনি করিল নির্ণয়॥

(কাশীরাম দাস)

পরের অভাব দেখিলে নিজের দুঃখ দূর হয়।

একদা ছিলনা 'জুতো' চরণ যুগলে,
দহিল হৃদয়বন সেই ক্ষোভানলে।
ধীরে ধীরে চুপি চুপি দুঃখাকুল মনে,
গেলাম ভজনালয়ে ভজন কারণে।
দেখি তথা একজন পদ নাহি তার,
অমনি 'জুতোর' খেদ ঘুচিল আমার।
পরের অভাব মনে করিলে চিন্তন,
আপন অভাব ক্ষোভ রহে কতক্ষণ?
'হায় আমি এলাম, একি ঘোর কাননে!
নিশির আন্ধারে পথ না দেখি নয়নে।

শীতের দাপটে কাঁপে থর থর কায়,
নাহি তায় গায়ে কিছু উহু প্রাণ যায়!'
'এইরূপে পথহারা পান্থ একজন,
নিশিতে করিতেছিল কাননে রোদন।
এমন সময়ে তারে এমন সময়,
জলদ গম্ভীর নাদে ডেকে কেহ কয়—
'হে পথিক, চুপকর ক'রো না রোদন,
একবার এসে মোরে কর দরশন।
বটে তুমি শীতে অতি যাতনা পেতেছ,
কিন্তু তবু মৃত্তিকার উপরে রয়েছ।
পড়িয়াছি আমি এই কূপের ভিতরে,
রহিয়াছি দুটি চোক ধরিয়া ডুকরে;
গলাবধি জলে ডোবা সকল শরীর,
রাখিয়াছি কোনরূপে উঁচু করি শির।
দেও তুমি ঈশ্বরেরে কৃতজ্ঞ অন্তরে
ধন্যবাদ, পড়নি যে কূপের ভিতরে।'

(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)

পারিব না।

১

'পারিবনা' একথাটি বলিও না আর,
কেন পারিবেনা তাহা ভাব একবার।
পাঁচজনে পারে যাহা,
তুমিও পারিবে তাহা,
পার কি না পার, কর যতন আবার,
একবারে না পারিলে দেখ শতবার।

২

'পারিব না' ব'লে মুখ করিওনা ভার,
ও কথাটি মুখে যেন শুনিনা তোমার ;
অলস অবোধ যারা,
কিছুই পারেনা তারা,
তোমায়'ত দেখিনা'ক তাদের আকার,
তবে কেন 'পারিব না' বল বার বার।

৩

জলে না নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার,
হাঁটিতে শিখে না কেহ না খে'য়ে আছাড়,
সাঁতার শিখিতে হ'লে,
আগে তবে নাব জলে,

আছাড়ে করিয়া হেলা, হাঁটি-আর বার,
পারিব বলিয়া সুখে হও আগুসার।

(কালীপ্রসন্ন ঘোষ।)

আত্মশ্লাঘা।

যশের বাসনা যদি কর প্রিয়গণ।
কর'না কর'না আত্ম-প্রশংসা কথন।
সত্য সত্য তবে এই জেন জেন সবে,
একদিন সে বাসনা পূর্ণ হবে হবে ;
কিন্তু যদি নিজ গুণ নিজে গান কর,
অপরের প্রশংসার আশা পরিহর।
আত্মগুণ গায়কের যশ হয় কবে ?
থাকুক যশের কথা ঘৃণে তায় সবে।
গাইত যদ্যপি শশী গুণ আপনার,
হ'ত কি সে তবে এত প্রিয় সবাকার ?

(হরিশ্চন্দ্র মিত্র)

উপদেশ-সার।

মনে স্থির করিয়াছ চির দিন কি সুখে যাবে।
জীবন যৌবন ধন মান রবে সমভাবে॥
এই আশাতরুতলে, বসিয়াছ কুতূহলে,
বিষয় করিয়া কোলে, জাননা ত্যজিতে হবে।
অরে মন শুন সার, দিবা অন্তে অন্ধকার,
সুখান্তে দুঃখেরি ভার, বহিতে হবে—
অতএব অবধান, যে অবধি থাকে প্রাণ,
ব্রহ্মে কর সমাধান, নির্ম্মল আনন্দ পাবে।

(রাজা রামমোহন রায়)

সমাপ্ত।